পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ১৪ বছর পূর্তি

সমুখে এগিয়ে চলার নতুন দিন

বিশেষ ক্রোড়পত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ১৪ বছর পূর্তি উদযাপন হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি।

বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং রাঙ্গামাটি নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অপার আধার। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছেন। তাদের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অঞ্চলগুলোকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। পার্বত্য জেলাগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতা ও উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। আমি বিশ্বাস করি শান্তি চুক্তির মাধ্যমেই পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির উন্নয়নে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহবান জানাই।

আমি পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ১৪ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: জিল্লুর রহমান

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ১৪ বছর পূর্তি

আজ ২ ডিসেম্বর। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দিন। ১৪ বছর আগে ১৯৯৭ সালের আজকের এই দিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দীর্ঘ দুই যুগ ধরে বিরাজমান সংঘাত ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসানে সূচিত হয় শান্তি, উন্নয়ন ও সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির মধ্যে দীর্ঘ রাজনৈতিক সংলাপের সফল পরিণতিতে স্বাক্ষরিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য অঞ্চলের দীর্ঘ পুঞ্জিভূত রাজনৈতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জাতীয় সংসদের তৎকালীন চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে গঠন করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি। পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির সাথে ধারাবাহিক রাজনৈতিক সংলাপের সফল পরিণতিতে সমঝোতায় উপনীত হয় জাতীয় কমিটি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি। কাঙ্খিত শান্তি পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষের মনে এনে দেয় স্বস্তি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি শুধু সারাদেশের শান্তিপ্রিয় প্রতিটি নাগরিককেই আশ্বস্ত করেনি- আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃতি লাভ করেছে, হয়েছে প্রশংসিত। ১৯৯৯ সনে শান্তি চুক্তির রুপকার জননেত্রী শেখ হাসিনা লাভ করেন ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার। এই চুক্তির আলোকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। শক্তিশালী করা হয়েছে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদকে। গঠন করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। ফলে পার্বত্য এলাকার উন্নয়নে সঞ্চারিত হয়েছে নতুন গতি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর যেসব পাহাড়ী পরিবার শরণার্থী হিসাবে পরদেশে আশ্রয় নিয়েছিলো, তারাও ফিরে এসেছেন নিজেদের আবাস ভূমিতে। প্রতিশ্রুত সুযোগ সুবিধা প্রদানসহ সরকার তাদের পুণর্বাসন করেছে। প্রত্যাগত শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দ্দিষ্টকরণ ও পুণর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কাজ করে চলেছে। ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির জন্য গঠিত ভূমি কমিশনও কাজ করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির শর্তগুলো বহুলাংশে বাস্তবায়িত হয়েছে। অবাস্তবায়িত অংশের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন। চুক্তি বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত গতি সঞ্চার করতে হলে শান্তি চুক্তির পক্ষের সকল শক্তিকে ইতিবাচক ও গঠণমুলক মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নকে বিলম্বিত করবে।

বাংলাদেশের এক রূপময় ভূ-খন্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম, যার প্রকৃতি সমতল থেকে একেবারেই ভিন্ন। সেখানে বিস্তৃত ধানক্ষেতে বাতাস ঢেউ খেলেনা, সেখানে পাহাড়ের পর পাহাড় স্থির ঢেউয়ের মত প্রলম্বিত হয়ে আছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, যা ঢেকে আছে চির সবুজ গাছ-গাছালীতে। সেখানে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় দুরন্ত পাখী, এলোমেলো মেঘ। এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়, এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় তাকালে মন ভরে যায় অনাবিল তৃপ্তিতে। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে বয়ে চলে অসংখ্য ছোট নদী, স্থানীয়রা যাকে ছড়ি বা ছড়া বলে। ছড়ি বা ঝরনা বা ছোট নদীর নামেই অনেক স্থানের নাম। যেমন- খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, লক্ষীছড়ি, রোয়াংছড়ি, বাঘাইছড়ি ইত্যাদি। পার্বত্য চট্রগ্রামের এ ছড়িগুলি দিয়ে এক সময় জলের মতই প্রবাহিত হচ্ছিল ঘৃণা আর হিংসা। আর ঐ হিংসায় কালো হয়ে গিয়েছিল সবুজ পাহাড় আর তার রাঙ্গা মাটি। ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির মাধ্যমে বন্ধ হয়েছে সংঘাত, হানাহানি, বন্ধ হয়েছে সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া হিংসার ঝরণাধারা।

যে কোন দেশে যে কোন সময় শান্তির পথে অভিযাত্রা একটি জটিল, দীর্ঘমেয়াদী ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। তবু গত ১৪ বছরে পার্বত্য চট্রগ্রামের আর্থ-সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের ২৫টি উপজেলায় ৩৫০০টি গ্রামে 'পাড়া কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৭০০টি পাড়ায় গড়ে তোলা হয়েছে আপদকালীন খাদ্য মজুদের জন্য Rice Bank. প্রায় ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে 'Promotion of Development and Confidence Building in Chittagong Hill Tracts' প্রকল্প। প্রথাগত নেতৃত্ব তথা চীফ, হেডম্যান ও কারবারীদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে শক্তিশালী করা হচ্ছে। বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও বিকাশে নেয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ। পাহাড়ী - বাঙ্গালী সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় পার্বত্য অঞ্চলে শান্তির অভিযাত্রা সমস্ত প্রতিকুলতাকে উপেক্ষা করে অব্যাহত থাকবে। পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যেই নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ১৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীসহ দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর কোন তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্বে এটি একটি বিরল ঘটনা।

এই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের জাতিগত হানাহানি বন্ধ হয়। অনগ্রসর ও অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি ও উন্নয়নের ধারা। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির জন্য ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার অর্জন এই চুক্তির আন্তর্জাতিক প্রশংসা ও স্বীকৃতির প্রতীক।

১৯৭৫ সাল পরবর্তী সরকারগুলো পার্বত্য অঞ্চলের সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বাঙালি-পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। খুন, রাহাজানি, অন্যের সম্পদ জবরদখল এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার এ অঞ্চলকে আরো অস্থিতিশীল করে তোলে। এমনি প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি দেশের অখন্ডতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার লক্ষ্যে একটি মহান পদক্ষেপ হিসেবে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়।

পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত জোট ঐতিহাসিক এই চুক্তির চরম বিরোধিতা করে পার্বত্য অঞ্চলকে পুনরায় অস্থিতিশীল করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের এ হীন উদ্দেশ্য সফল হয়নি। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র শান্তি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। এ শান্তির বার্তা আমরা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে চাই।

আমি পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সংসদ উপনেতা
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ও
আহ্বায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত রেখে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া তরান্বিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ১৪ বছর পূর্তিতে সমগ্র পার্বত্যবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এই অঞ্চলকে নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে তাদের নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস পেয়েছে। তারা সেখানে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি, আলোচনার পরিবর্তে অস্ত্রের ঝনঝনানি আর সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে উস্কে দিয়েছে বার বার। এমনি এক সংঘাতময় পরিস্থিতিতে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের ফলে স্বাক্ষরিত এ চুক্তি পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে অনাগ্রহ ও নিষ্ক্রিয়তার কারণে যে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা কাটিয়ে উঠে ইতোমধ্যেই চুক্তির সফল পূর্ণ বাস্তবায়নে গতি ফিরে এসেছে।

নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিশেষ ঐতিহ্যমন্ডিত পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে যুগান্তকারী এই চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে আমি সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, এমপি

প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তির ১৪ বছর পূর্তিতে কৃতজ্ঞতার সাথে সমগ্র পার্বত্যবাসীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

যুগান্তকারী এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরই ১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মধ্য দিয়ে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী দীর্ঘদিন বিরাজমান ভূমি সমস্যা সমাধানে ভূমি কমিশন গঠন, শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুর্নবাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠনসহ অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে থাকে। কিন্তু ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার এই চুক্তি সময়ের স্বল্পতার কারণে এর পূর্ণবাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরই তৎকালীন বিরোধীদল বিএনপি এই চুক্তিকে সাম্প্রদায়িক ও কালোচুক্তি আখ্যায়িত করে তা বাতিলের দাবিতে মিছিল-সমাবেশ করেছিল, এমনকি ২০০১ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে তারা পরিস্কারভাবে ঘোষণা করেছিল যে, যদি এই নির্বাচনে তারা সরকার গঠন করে তাহলে চুক্তি বাতিল করবে। কিন্তু ঐ নির্বাচনে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতাসীন হলে তাদের নির্বাচনী ওয়াদা মোতাবেক চুক্তি বাতিল না করে তা বাস্তবায়নের জন্য তৎকালীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভুঁইয়ার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। কার্যত ঐ কমিটি তাদের মেয়াদকালে ১১ বার বৈঠক করলেও চুক্তি বাস্তবায়নে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরং চুক্তি বহাল রেখেই তারা সেখানকার স্থিতিশীলতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। শান্তি চুক্তি পূর্ব দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে তাদের এই হীন প্রচেষ্টাকে পাহাড়ের শান্তিপ্রিয় মানুষ ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারও শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর কোন ভূমিকা পালন করেনি।

বর্তমান সরকারের সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মাননীয় সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে আহবায়ক করে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি, ভূমি কমিশন, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদসহ সমস্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। ভূমি বিরোধ সমস্যা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যা। পুনর্গঠিত ভূমি কমিশনের আইনী দুর্বলতার কারণে এ বিষয়ে কাজের প্রত্যাশিত গতিশীলতা ফিরে আসেনি। এ আইনের কয়েকটি ধারা সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ কাজ করছে। আগামী সংসদ অধিবেশনে সংশোধনী আনা সম্ভব হবে বলে আশা করি। এ চুক্তি বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত গতি সঞ্চারিত না হওয়ার জন্য আমরাও সন্তুষ্ট নই। তবে এটা বলে রাখা ভাল - চুক্তির পূর্ণবাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলপক্ষের ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা না থাকলে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া মসৃন ও স্বচ্ছন্দ্য হবে না।

বর্তমান সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সার্বিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় সরকারকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকরী করার জন্য সরকারী ২১টি দপ্তর/বিভাগকে ইতোমধ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং খাগড়াছড়ি যুব উন্নয়ন অফিস, প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (পিটিআই)- রাঙ্গামাটি, তিন পার্বত্য জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ-এই চারটি দপ্তর হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া পার্বত্য এলাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, ধর্মীয় তথা গ্রামীন অবকাঠামো খাতে ব্যাপক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়নের ধারা এ এলাকায় দীর্ঘদিন চলমান সাংঘর্ষিক অবস্থার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর পারস্পরিক সহনশীলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে।

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ১৪ বছর পূর্তিতে আমি এর পূর্নবাস্তবায়নের জন্য সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা এবং ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

দীপংকর তালুকদার, এমপি

সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। যুগান্তকারী এ চুক্তি স্বাক্ষরের সন্ধিক্ষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করাসহ সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকারের সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতিফলনেই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করে। শান্তি চুক্তির সুবাদে দীর্ঘ রাজনৈতিক হানাহানি আর সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হয় পারস্পরিক আস্থা আর সহনশীলতা । বিগত জোট সরকারের সময় এ অঞ্চলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। বর্তমান মহাজোট সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পার্বত্য এলাকায় পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আশা করছি ভবিষ্যতে এ উন্নয়নের অগ্রযাত্রা আরও দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাবে। পার্বত্য অঞ্চলের অফুরান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ন্যায় এ-অঞ্চলটি সমৃদ্ধ রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরে উঠুক এ প্রত্যাশা করছি।

আমি এ মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

মোহাম্মদ শাহ আলম, এমপি

ভারপ্রাপ্ত সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আরণ্য প্রকৃতির অনিন্দ্য নিসর্গ শোভায় ঋদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম রূপসী বাংলার এক রূপময় ভূ-খন্ড। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম। ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় তাঁর উপস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে অবসান হয় দুই দশকের রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহের; পার্বত্য জনপদে ফিরে আসে শান্তি ও স্বস্তি। পুনর্গঠিত হয় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। বাংলাদেশ সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় নেয়া হয় বিভিন্ন সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, যার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলে বসবাসকারী ১১টি ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও বাংলাভাষী মানুষের জীবনে সূচিত হয়েছে দিন বদলের পালা।

স্বাধীনতার চল্লিশ বছর উদ্‌যাপনের এই বছরে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের চতুর্দশ বার্ষিকীও পালিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় শান্তি চুক্তির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এবং সম্প্রীতি ও উন্নয়নের মেলবন্ধন রচনার মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শান্তি ও অগ্রগতির অভিযাত্রা অব্যাহত থাকুক- এ কামনা করি।

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি